বিচার বিভাগ – সংকট কমছে না

ড. শাহদীন মালিক, নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

সমস্যাঃ

ইদানিং মাননীয় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন যে, এখন বিচার বিভাগ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি স্বাধীন এবং বিচার বিভাগের ওপর জনগণের আস্থা বেড়েছে। কথাগুলো সত্য, কিন্তু এতে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা চাই বিচার বিভাগের আরও বেশি স্বাধীনতা আর জনগণের আরও বেশি আস্থা। কারণ এই স্বাধীনতা এবং আস্থাই কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

কেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা? সামন্তবাদী যুগে সব ক্ষমতা রাজা-মহারাজাদের হতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সেই সময়ে রাজা-মহারাজারা একনাগাড়ে ছিলেন আইনপ্রণেতা, বিচারক ও আইন প্রয়োগকারী। ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এর অপপ্রয়োগ। তাই সামন্তবাদী যুগে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। এমন অপপ্রয়োগ রোধ এবং নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করতে ব্যারন ডি মন্টেসকোর মত পণ্ডিতরা ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির (Principles of Separation of Powers) উদ্ভাবন করেন। এই নীতির ভিত্তিতে সরকারি ক্ষমতাকে তিনটি অর্গান বা বিভাগে – আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগে – বিভাজন করা হয়। এই তিনটি বিভাগকে সম কিন্তু ভিন্ন (equal but different) ক্ষমতা দেওয়া হয়। ক্ষমতার এমন বিভাজনের নীতির উদ্দেশ্য হলো এর কেন্দ্রীকরণ রোধের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করা। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন 'চেকস্ অ্যান্ড ব্যালেন্স' পদ্ধতি এখন আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি যত সহজে কার্যকর করা যায়, সংসদীয় ব্যবস্থায় তা তত সহজ নয়। এর অন্যতম কারণ হলো সংসদীয় পদ্ধতিতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ আইনসভারও সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী সাধারণত সংসদ নেতা হয়ে থাকেন।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সময়কালটা বাদ দিলে, এখন নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে টানাপোড়েন সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। এই ধাক্কাধাক্কিতে ইদানিং যুক্ত হয়েছে সংসদও। নতুন বিচারপতি নিয়োগ হচ্ছে না, বিচারপতি নিয়োগে আইনের কথাও আলোচনায় আসছে না। নিম্ন আদালতের অনেকগুলো পদ শূন্য। নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতি নিয়ে আইন মন্ত্রণালয় ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে টানাহেঁচড়া সম্ভবত অতীতের যেকোনো সময়ের থেকে বেশি। এই টানাহেচড়ার মূল কারণ হলো যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অঙ্গীকার আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত এবং এ সম্পর্কিত মাজদার হোসেন মামলায় প্রদত্ত সুপ্রিম কোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও, আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে অঙ্গীকার করেও তা পূরণে বারবার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

বাজেট বা অর্থ বরাদ্দ নিঃসন্দেহে বিচার বিভাগের কার্যকারিতার একটা অন্যতম নিয়ামক। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছর দুটিতে সুপ্রিম কোর্টের উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ শূন্য টাকা। ষোড়শ সংশোধনী প্রবর্তন এবং পরবর্তীতে আদালতের দ্বারা বাতিলের ঘটনায় নিকট ভবিষ্যতে একদিকে বিচার বিভাগ ও অন্যদিকে নির্বাহী ও আইন বিভাগের মধ্যে টানাপোড়েন বাড়াতে পারে। অর্থাৎ বিচার বিভাগ স্বাধীন, কিন্তু মোটেও চাপমুক্ত নয়। বরং আশঙ্কা হয়, নির্বাহী বিভাগে এই ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হচ্ছে যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপগুলোকে হয়তো ব্যাহত করতে পারে বিচার বিভাগ এবং সহায়তাও করতে পারে বিচার বিভাগ। ফৌজদারি মামলায় নিম্ন আদালতের এই সহায়ক ভূমিকাটা অনেক বেশি স্পষ্ট। আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ও মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের কোনো আইনি ভিত্তি ছাড়া সারাদেশে ডজন ডজন মামলা গ্রহণ এই সহায়ক ভূমিকার উদাহারণ। রিমান্ডের আদেশ খুবই ব্যতিক্রমী অপরাধের ব্যাপারে এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত নির্দেশনাগুলো মেনে হবার কথা। সংবাদ মাধ্যমে সাড়া জাগানো অপরাধগুলো প্রায় কোনোটিতেই পুলিশের রিমান্ডের আবেদন নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটরা নাকচ করেন না। এর মূল কারণ হলো আদালত পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন নয়।

প্রসঙ্গত, আমাদের সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, আইনসভার সদস্যগণ বহু খাটা-খাটনি করে আইন প্রণয়ন করেন, কিন্ত উচ্চ আদালতে দুইজন বিচারক তাঁদের কলমের খোঁচায় তা বাতিল করে দেন, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এধরনের অভিমত ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতারই প্রতিফলন। ক্ষমতার বিভাজনের নীতি অনুসরণে আমাদের সংবিধানে আইনসভাকে আইন প্রণয়নের, নির্বাহী বিভাগকে আইন প্রয়োগের এবং বিচার বিভাগকে বিচারিক পর্যালোচনার (Judicial review) ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিচার বিভাগের বিচারিক ক্ষমতার মধ্যে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান অন্তর্ভুক্ত। তাই বিচারিক পর্যালোচনার এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ আদালত সংসদে পাশ করা যেকোনো আইনকে অসাংবিধানিক বা বেআইনি ঘোষণা করতেই পারেন – সংবিধান আদালতকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০২)। আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স পদ্ধতির এটাই উদ্দেশ্য। এছাড়াও উচ্চ আদালত যেকোনো আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে কতগুলো 'প্রিন্সিপালে' বা নীতির ভিত্তিতে, মনগড়াভাবে নয়। উল্লেখ্য, বিচার বিভাগের বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ এবং সংসদ আইন করেও তা রহিত করতে পারে না।

সমাধানের পথঃ

বলাবাহুল্য সমস্যার উপরের ফিরিস্তি সহজেই দীর্ঘায়িত করা যায়। সমস্যাগুলো আমরা সবাই কম বেশি জানি। সমস্যাগুলোর সমাধানে প্রথমেই আসে অর্থ ও সম্পদের কথা। ঐতিহাসিকভাবে বিচারের জন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ সরকারের মাছ, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের জন্যে বরাদ্দের চেয়ে অনেক কম। হাঁস-মুরগি, ডিম, মাছ ও ছাগল সবই আমাদের দরকার। কিন্তু ন্যায়বিচারটা আরও বেশি দরকার। আমরা বহু বছর ধরেই বলে আসছি ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়ার মত দেশগুলোতে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয় হত, তার পরিমাণ আমাদের হাঁস-মুরগির থেকে বোধহয় ৫০ গুণ বেশি। অন্যকথায়, এই সব দেশে মাথাপিছু গড় আয় আমাদের থেকে ২০-৩০-৪০ গুণ বেশি ছিলো, কিন্ত ঐসব দেশগুলোর বিচার বিভাগের বাজেটও কম ছিলো, আর সরকারের নিয়ন্ত্রণও বেশি ছিলো। বিচার বিভাগের দুর্বলতা প্রায় প্রতিটি দেশেই অশান্তি ও সহিংসতার প্রধান কারণ। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি অশান্তি ও সহিংসতা হয়েছিলো পার্বত্য জেলাগুলোতে। কম বেশি ১০ বছর আগ পর্যন্ত পার্বত্য জেলা তিনটিতে কোনো আদালত ছিলো না বললেই চলে। শক্ত-সবল-স্বাধীন-কার্যকর বিচার ব্যবস্থার সাথে অশান্তি ও সহিংসতার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। বিচার ব্যবস্থা যত দুর্বল হবে, অশান্তি ও সহিংসতা ততই বাড়বে। এরকম অবস্থায়, অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না, তবে উন্নয়নের চাকচিক্য প্রকটভাবে দৃশ্যমান হবে।

অতএব, বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। গত অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিলো ১ হাজার ৫২১ কোটি টাকা। আসছে বছরের জন্য (২০১৭-১৮) বরাদ্দ প্রায় ১০০ কোটি টাকা কমিয়ে করা হয়েছে ১ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্টের বরাদ্দ গত বছরের ১৬৭ কোটি থেকে কমে আসছে বছরের জন্যে হয়েছে ১৬৫ কোটি টাকা। অথচ, গতবছরের তুলনায় আগামী বছরে (২০১৭-১৮) দেশের বাজেটের পরিমাণ বেড়েছে কম বেশি ৭০ হাজার কোটি টাকা। বিচারের বাজেট বাড়েনি, বরং কমেছে।

আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, বিচারের জন্য বাজেট সংক্রান্ত কোনো আলাপ আলোচনা বা দাবি আইনজীবী মহল থেকে উত্থাপিত হয় না। বার কাউন্সিল ও বার অ্যাসোসিয়েশনগুলোর বাজেট চিন্তা বার ভবন নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে আইনজীবী মহল ও নাগরিক সমাজকে সোচ্চার হতে হবে। কম বেশি ১ হাজার ৬০০ বিচারক দিয়ে ১৬ কোটি লোকের দেশের বিচার ব্যবস্থা চলতে পারে না। বাজেট বাড়িয়ে বিচারকের পদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

সঠিক ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করে। এজন্য পুলিশ ও বিচারকের সাথে সাথে দরকার দক্ষ ক্যাডারভিত্তিক সরকারি প্রসিকিউশন অথবা অ্যাটর্নি সার্ভিস। এমনকি দক্ষিণ এশিয়া ও আশপাশের দেশগুলোর মধ্যে আমরাই একমাত্র দেশ যেখানে সরকারের ক্যাডারভিত্তিক অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী প্রশিক্ষিত আইনজীবী নেই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিু আদালতের বিচারকরা প্রেষণে এসে আইনজীবীর কাজ করেন। আর সরকারি দল বদলের সাথে সাথে পাবলিক প্রসিকিউট ও সরকারি কৌশলীরা তাদের সব সাঙ্গপাঙ্গ-সহ সদলবলে বিতাড়িত হন। যে আইনজীবীরা নতুন সরকারি দলের পক্ষে 'চোঙ্গা-ফুঁকতেন' তারা সদর্পে আবির্ভূত হন পাবলিক প্রসিকিউটর, সরকারি কৌশলী হিসেবে। এধরনের অদ্ভুত এবং ন্যায়বিচারের জন্য হুমকিমূলক এই ব্যবস্থার অবশ্যই নিরসন হতে হবে। অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সংবিধানের ৯৫(২)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিচারপতি নিয়োগের স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ প্রতিস্থাপন করে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। উপরোল্লেখিত ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বা বিচার বিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, বিচারপতি নিয়োগ এবং প্রসিকিউশন ও অ্যাটর্নি সার্ভিস সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন দুরূহ ব্যাপার না। কারণ, গত সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে এই দুটি বিষয়ে দুটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৮' এর বিভিন্ন অসংগতির কারণে এটার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি মামলা হয়। মামলার রায়ে ওই অধ্যাদেশটির একটি প্রধান ধারা তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ অবৈধ ঘোষণা করেন। আর সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর অধীনে সার্ভিস গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সরকার এই অধ্যাদেশটি আইনে রূপান্তরিত না করার কারণে সার্ভিসটির অবসান ঘটে। অর্থাৎ দুটি ব্যাপারেই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আইনি কাঠামো প্রণয়ন করে নতুন উদ্যোগ দুরূহ হবে না। প্রয়োজন বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সদিচ্ছা।

উপসংহারঃ

গণতন্ত্র যখন কম থাকে আর কর্তৃত্ববাদী সরকার বেশি থাকে, তখন ন্যায়বিচার ও বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সবাই সচেষ্ট হতে থাকে। বিচার বিভাগের পক্ষে দাঁড়াবার লোকজন কমতে থাকে। বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ কম হলে উন্নয়ন দ্রুত হবে – এই ধারণার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এসবই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। নিঃসন্দেহে দেশে গণতন্ত্রের সংকট চলছে। তাই আমাদের সবার দায়িত্ব হবে বিচার বিভাগকে আরও স্বাধীন, আরও সুদৃঢ় ও আরও কার্যকর করার জন্য বিচার বিভাগের পাশে ও পক্ষে দাঁড়ানো। একইসঙ্গে বিচারকদেরও দায়িত্ব স্বাধীন মানসিকতা অব্যাহত রাখা।

প্রবন্ধটি ১১ জুলাই ২০১৭ তারিখে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত